কৃষি ব্যবস্থার সংকট

দেড়শো বছর ধরে মুঘল সাম্রাজ্য এই উপমহাদেশে একটা একতাবদ্ধ কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা চালু রেখেছিল। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে আগ্নেয়াস্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার এশীয় সাম্রাজ্যগুলির তৈরি হবার কারণ, বিশেষত ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের বেলায় এই মত কতটা প্রযোজ্য সেটা ভেবে দেখা দরকার। এরা কামানের ব্যবহার করে শক্ত দুর্গের বিপক্ষে সাফল্য পায়নি। প্রথমদিকে এদের শক্তি নিহিত ছিল ওদের অশ্বারোহীর উপরে, বিশেষত ঘোড়ার উপরে ধনুকধারীর ব্যবহারের উপর। খোলা যুদ্ধক্ষেত্রে গতিশীল অশ্বারোহীদের আক্রমণ ছিল এদের প্রধান অস্ত্র। মারাঠারা অবশ্য ছাড়াছাড়া ও বিকেন্দ্রীভূত আক্রমণ করে এই শক্তিকে নিস্তেজ করতে সমর্থ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তীরধনুকের বদলে সৈন্যদের প্রধান অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায় বন্দুক। এর ফলে পদাতিক সৈন্যদের খুব সুবিধা হয়ে যায়। *মনসবদারদের* প্রধান সৈন্যদল ছিল অশ্বারোহী। সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির সঙ্গে জায়গীর প্রথার একটা যোগাযোগ আছে। আকবর শূরদের সাধারণ শাসনতন্ত্র নিলেও *মনসবদারী* প্রথা উন্নত করে কেন্দ্রীভূত করে যান। ১৫৮০ সালের বিদ্রোহ ছাড়া ১৭০৭ সালের মধ্যে মুঘল শাসকশ্রেণীর মধ্যে বড় কোন বিদ্রোহ হয়নি। অন্তর্নিহিত চাপ নিশ্চয়ই ছিল কারণ বিভিন্ন উপাদান—জাত, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে মুঘল শাসকশ্রেণী তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মূল কাঠামোতে যে নিবিড়তা ছিল সেটা ১৬৫৮-৫৯ বা ১৭০৭ সালের গৃহযুদ্ধে বোঝা যায় কারণ সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়নি। ১৬৭৯-৮০ সালে রাজপুত বিদ্রোহ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুকাল পরে রাজপুতরা আবার পুরানো অবস্থায় ফিরে আসে।

মুঘলরা যে জায়গীর প্রথা গড়ে তুলেছিল তার মধ্যে ছিল একটা অর্থনৈতিক ধারণা। জায়গীরদারদের জমির উপরে কোন স্থায়ী অধিকার ছিল না এবং কেবলই অর্থের ভিত্তিতে রাজস্ব তোলার অধিকার ছিল। যেখানে বাজারী অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানে এটা চলত ভালোভাবেই। এর মানে অবশ্য দাঁড়ায় যে কৃষিপণ্যের বাণিজ্য বিস্তৃত হচ্ছে। এটা ভালো চলতে পারে যেখানে একটা কেন্দ্রীভূত শক্তি একই ধরনের কর প্রথা চালু করেছে এবং যেখানে পথঘাটগুলি ঐ শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সুতরাং জায়গীর প্রথা শক্তিশালী হয়ে উঠলে ঐ অর্থনৈতিক শক্তিগুলি সংহত হয়ে আসবে।

কেন্দ্রীভূত মুঘল সাম্রাজ্যে সম্রাটই ছিলেন শক্তির মূল উৎস এবং জায়গীরদাররা মুঘল শাসকশ্রেণীর অন্তর্গত হলেও সম্রাটের কাছ থেকে যা সুবিধা পাচ্ছে সেটা ছাড়া আর কোন অধিকার পেতে পারে না। জায়গীরদারকে কতকগুলি নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হত। কেন্দ্রীয় শাসক নিয়ম করে দিয়েছিল কিভাবে করের হার ঠিক হবে, কতটা কর

Scanned with CamScanner

নেওয়া যাবে এবং কিভাবে ঐ কর নেওয়া হবে। অন্যান্য কি কর নেওয়া যাবে সেটাও সম্রাট বেঁধে দিয়েছিলেন। কানুনগো, চৌধুরী ও ফৌজদার জায়গীরদারের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত।

দুটি উপাদান কেন্দ্রীয় রাজস্ব নীতিকে প্রভাবান্বিত করেছিল। একটি হচ্ছে জায়গীরের রাজস্ব বাড়িয়ে দেখানো যাতে বড় সাময়িক সৈন্যদল *মনসবদার* রাখতে পারে। দ্বিতীয়ত, এটা বোঝা গিয়েছিল যে রাজস্বের দাবি যদি খুব বেশি চড়া হারে বাঁধা হয়, তাহলে কৃষক না খেতে পেয়ে মারা যাবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় শাসন এমন রাজস্বের হার করেছিল যাতে কৃষকের জীবনধারণের মত অর্থ থাকে। ওদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনই মুঘল শাসকশ্রেণীর দৌলত তৈরি করেছিল। এ সত্ত্বেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শাসকশ্রেণীর মধ্যে একটা উদ্যোগ ছিল আরো বেশি চাপ দিয়ে অর্থসংগ্রহ করা, যে ধারাটি জায়গীর প্রথার মধ্যেই নিহিত ছিল। সাম্রাজ্যের সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কেন্দ্রীয় শাসন এই প্রচেষ্টাকে থামানোর চেষ্টা করে। এটা বলা হয় যে সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজস্বের পরিমাণ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। আসলে নগদ টাকায় রাজস্ব নেওয়া হত এবং তার পরিমাণ বেড়েছিল ঠিকই, কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধির হার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির হারকে কখনো ছাড়িয়ে যায়নি। কিন্তু জায়গীরদারদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসনের একটা দ্বন্দ্ব ছিল। জায়গীরদার জানত যে সে তিন-চার বছরের বেশি এক জায়গীরে থাকবে না এবং যে কোন দিন অন্যত্র বদলী হয়ে যেতে পারে। ফলে জায়গীরের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোন দূরপাল্লার নীতি সে নিতে চাইত না। অন্যদিকে অত্যাচার করে যদি সে কিছু অর্থ লাভ করতে পারে, তাহলে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সেটা করতে সে পিছপা হত না। এখানে কৃষকের কর দেবার উপায় আছে কিনা সেটা না দেখে সে কৃষককে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। সমকালীন লেখকরা দেখেছেন যে উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতালোভী অভিজাতরা কৃষকদের প্রতি কোন অনুকম্পা প্রদর্শন করে না। আকবরের উচ্চপদস্থ মন্ত্রী মুরতাজা খান বুখারীর সম্বন্ধে সমকালীন এক লেখক বলছেন যে বুখারী তাঁর জায়গীরের জমার উপরে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কর বাড়িয়েছিলেন। যদি কৃষকরা পালায় তাহলে তিনি ঐ জায়গীর ফেরৎ দিয়ে আর একটা নিতেন। শাহজাহানের সময়েও এইরকম জায়গীরদারের কথা জানা যায়। এদের কোন ক্ষতি হয়নি।

ইউরোপীয় পর্যটকরা আকবরের সময় থেকেই অত্যাচারী জায়গীরদার ও রাজস্ব আমলাদের কথা বলছে। বার্নিয়ার তাঁর একটি বিখ্যাত চিঠিতে জায়গীরদারদের এইরকম মনোভাবের কথা বলেছেন যেখানে তারা যথাসম্ভব কৃষকদের কাছ থেকে নেবে। তাতে যদি কৃষকরা অভুক্ত থাকে তাহলেও তাদের কিছু আসবে যাবে না, কারণ কিছুদিন পরেই তারা অন্য জায়গীরে বদলী হয়ে যাবে। বার্নিয়ার এই অত্যাচারের জায়গীর বদলীর প্রথার মধ্যে ধরেছেন, যে কথা আওরঙ্গজেবের রাজস্বের শেষদিকে ঐতিহাসিক ভীমসেন বুরহানপুরী বলেছেন। জায়গীরদারদের আমিলরা নিজেদের চাকরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল না। ফলে তারাও কোনরকম দয়া না করে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার চালাত। এরপরে যখন জায়গীরদার

Scanned with CamScanner

তার জায়গীর ইজারা করে দেয়, তখন অবস্থা আরো খারাপ হয়েছিল। শাহজাহানের সময়কার লেখক সাদিক খান বলছেন যে ঘুষ ও ইজারার ফলে জমিগুলো নষ্ট হয়ে গেল। এ থেকে বোঝা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীতে একটা ধারণা এসে গিয়েছিল যে জায়গীর বদলানোর ফলে কৃষকদের উপর বল্গাহীন অত্যাচার হচ্ছে। কেন্দ্রীয় শাসন এটা কিছু সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, কিন্তু বেশি সময়ের জন্য এটা করা দুঃসাধ্য ছিল। আসলে কেন্দ্রীয় নিয়মাবলীর মধ্যেই জায়গীরদারকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যেখানে দেওয়া হয়নি সে নিয়মগুলি জায়গীরদাররা সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছে বা গোলমালের সুযোগে কর্ণপাত করেনি। আওরঙ্গজেবের ১৬৬৫ সালের একটা *ফারমান* থেকে জানা যায় যে গুজরাটের কয়েকজন *মনসবদার* উৎপাদনের থেকে বেশি কর নিচ্ছে ভুল হিসেব দেখিয়ে।

এর ফলে কোন কোন জায়গায় করের বোঝা এত বেশি হয়ে যায় যে কৃষকের পক্ষে বেঁচে থাকাই শক্ত হয়ে পড়ে। শাহজাহানের সময়কালের পর্যটক পাদ্রী মানরিক বলছেন যে এই ভারী কর কৃষকরা না দিতে পারলে তাদের নিষ্ঠুরভাবে মারধোর করা হতে থাকে। মানুচ্চী বলছেন যে কৃষকদের স্বভাবই হল কর না দেওয়া এবং তাদের উপর তখন এত অত্যাচার করা হয় যে কখনো কখনো তারা মারা যায়। অনেক সময়েই কৃষকরা তাদের স্ত্রী, পুত্রকন্যা, গবাদিপশু বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় কর দেবার জন্য। অনেক সময়ে এই বিক্রি স্বতঃপ্রবৃত্ত নয় এবং বিদ্রোহের অভিযোগ করে স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের বিক্রি করে দেওয়া হয় জোর করে। ঐসব কৃষকদের বন্দী করে লোহার শিকলে বেঁধে বাজারে নিয়ে যাওয়া হয় বিক্রি করার জন্য দাস হিসেবে এবং এদের পিছনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্ত্রীরা আসতে থাকে।

মুঘল সাম্রাজ্যে একটা আইন ছিল যে কোন জায়গীরদার বা ফৌজদারী এলাকাতে চুরি হলে জায়গীরদার বা ফৌজদার হয় চোর ধরবে না হলে নিজে ক্ষতিপূরণ দেবে। এর সুযোগ নিয়ে এরা যে কোন গ্রাম লুট করতে পারত। পর্যটক পিটার মুন্ডি বলছে যে কেবল-মাত্র সন্দেহের বশে পুরুষদের মেরে ফেলে স্ত্রী, পুত্রকন্যাদের নিয়ে গিয়ে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হত। সম্রাটের দরবারে গ্রামের লোকেদের এরকম আর্জি ছিল ফৌজদারের বিরুদ্ধে। আবুল ফজল বলছেন যে আকবর ঐ ধরনের যুদ্ধের পর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বিক্রি করা বন্ধের আদেশ দিয়েছিলেন, কারণ এটা দেখা গিয়েছিল যে কিছু লোভী লোক মিথ্যা অভিযোগ এনে এই ধরনের কাজ করছে। সমকালীন সূত্রে বারবার বলা হচ্ছে যে ক্রমাগত অত্যাচার চালানোর ফলে কৃষি উৎপাদন পড়ে যেতে থাকে এবং কৃষকরা গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। পাদ্রী জেভিয়ার বলছেন যে গুজরাট ও কাশ্মীরে মুঘল বিজয়ের পর কৃষকদের দুরবস্থা অনেক বেশি বেড়ে যায় কারণ মুঘলরা তাদের অত্যাচারের ফলে সব কিছু নষ্ট করে দেয়। ১৫৭৪ সালে সাম্রাজ্যের মাঝামাঝি প্রদেশগুলিতে আকবর *কারোরী* প্রথা শুরু করলে তাদের অত্যাচারে কৃষকরা পালাতে থাকে এবং কৃষি উৎপাদন ব্যাহত

Scanned with CamScanner

ইরফান হাবিব দেখাচ্ছেন যে ১৫৯৫ সাল থেকে ১৭০৭ সালের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে বাদ দিয়ে *জমা* বাড়ে শতকরা ৭৮ ভাগ। ঐ সময়ে সোনার মূল্য বাড়ে শতকরা ৫০ ভাগ এবং তামার মূল্য বাড়ে শতকরা ১০০ ভাগ। সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী প্রদেশগুলিতে পণ্যের মূল্য তামার মূল্যের মতই বাড়ে। সুতরাং বাস্তবে *জমা* বাড়েনি। কৃষি উৎপাদন ও *জমার* সম্পর্ক যদি আগের মতই থাকে, তাহলে কৃষি উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির (প্রতি বছর ০.২১ শতাংশ বাড়ছে বলে হিসাব করা হয়েছে) সঙ্গে সমান তাল রেখে চলেছিল।

সমসাময়িক সূত্র থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হল যে কৃষকদের গ্রাম পরিত্যাগ করা একটা সাধারণ ব্যাপার, যেটা সময়ের সঙ্গে বাড়ছে। যেহেতু চাষযোগ্য জমি অনেক ছিল সুতরাং কৃষকদের গ্রাম পরিত্যাগ করা নূতন নয়। দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামকে গ্রাম অন্য জায়গায় চলে যেত। কিন্তু এদের চলে যাওয়ার মূল কারণ ছিল আমলাদের অত্যাচার। এই জন্যই সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছে যে কৃষকরা যদি আগে রাজস্ব দেওয়ার জমিতে না থাকত,

Scanned with CamScanner